কপোট্রনিক বিভ্রান্তি (এক)

ঘরঘর করে ধাতব দরজাটি নেমে এসে আমাকে ল্যাবরেটরির ভৌতিক কক্ষে আটকে ফেলল। বের হবার অনেক কয়টি দরজা আছে, সেগুলি খোলা না থাকলেও প্রবেশপথে সুইচ প্যানেলের সামনে অপেক্ষমাণ রবোটটিকে বললেই আমাকে বের করে দেবে। কিন্তু তবুও কেন জানি আমার মনে হল আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। আর দশ মিনিটের ভিতরে এই ল্যাবরেটরি-কক্ষে যে অস্বাভাবিক পরীক্ষাটি চালানো হবে, তাতে যে-পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হবে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ একটি শক্তিশালী ঘোড়াকে এক সেকেণ্ডের ভিতর মেরে ফেলতে পারে। কাজেই দশ মিনিটের আগেই আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। আমি ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে বের হবার জন্যে ল্যাবরেটরির অন্য পাশে চলে এলাম। দশ মিনিটের এখনো অনেক দেরি, কিন্তু আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ করলাম, ইমার্জেন্সি এক্সিটের হ্যান্ডেল ধরার সময় আমার হাত অল্প কাঁপছে।

হ্যান্ডেলে চাপ দেয়ার পূর্বমূহূর্তে আমার মনে হল দরজাটি খোলা যাবে না। কেন মনে হয়েছিল জানি না, এরকম মনে হওয়ার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু যখন বারবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়েও দরজাটি খুলতে পারলাম না, তখন কেন জানি মোটেই অবাক হলাম না। মৃত্যুভয় উপস্থিত হলে হয়তো অবাক হওয়া বা দুঃখিত হওয়ার

মতো সহজ অনুভূতিগুলি থাকে না। আমি লাভ নেই জেনেও ল্যাবরেটরির সব কয়টি দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। পরীক্ষাটি বিপজ্জনক, তাই এগুলি অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ইমার্জেন্সি এক্সিটটি সত্যিকার ইমার্জেন্সির সময় ব্যবহার করতে পারব, কিন্তু এখন দেখছি এটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ল্যাবরেটরির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি—কোনো উপায় নেই, মারা যাচ্ছি—এই ধরনের চিন্তা, হতাশা আর আতঙ্ক আমাকে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছিল না। আমি নিজেকে বোঝালাম, হাতে খুব কম সময়, এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব, আর বের হতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমার মনে হল রবোটটিকে বুঝিয়ে বললে আমাকে বের করে দেবে। এখনো রবোটকে কিছু না বলেই হতাশ হয়ে যাবার কোনো অর্থ নেই।

আমি কয়েকটা মোড় ঘুরে ল্যাবরেটরির শেষ ঘরটিতে পৌঁছলাম। এখানে একটি ছোট্ট ফুটো আছে। সেদিক দিয়ে মাথা বের করে পাশের ঘরে তাকানো যায়। পাশের ঘরটিতেই একটি অতিকায় রবোট একরাশ সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাছে টিকিস্-টিক্ টিকিস্-টিক্ করে একটা ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি সময় ঘোষণা করে যাচ্ছে। প্রতি তিন সেকেণ্ড পরপর একটা লাল আলো ঝিলিক করে সারা ঘরকে আলোকিত করছিল। সব কিছু ছাপিয়ে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম—

এই, এই রবোট। রবোটটির নাম আমার মনে নেই। সেটি মাথা তুলে তাকাল। বলল, কি?

আমি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমি ভিতরে আটকা পড়ে গেছি। ইমার্জেন্সি দরজাটা খোল তো।

সম্ভব নয়। রবোটটির এই নির্বোধ অথচ নিষ্ঠুর উত্তর শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওকে হাজার যুক্তি দেখিয়েও টলানো যাবে না। এইসব রবোট বহু পুরানো আমলের। মানুষের শরীর যে রবোটের মতো যান্ত্রিক নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় অতি অল্প তারতম্যেই যে মানুষ মারা যেতে পারে এবং মানুষের মৃত্যু যে মোটেই আর্থিক ক্ষতি নয়—একটা মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়, এই ধারণা এইসব রবোটের কপেট্রনে দেয়া হয় নি। এই রবোটটি নির্বিকারভাবে আমাকে এখানে আটকে রাখবে এবং আমার মৃত্যু তার কপেট্রনের চৌম্বকক্ষেত্রে এতটুকু আলোড়নের সৃষ্টি করবে না।

আমি আবার কথা বলতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শুকনো গলাতেই বললাম, তুমি আমাকে বের হতে না দিলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।

কী ক্ষতি?

আমি মারা যাব।

মানে?

তোমার কপেট্রনটি ভেঙে ফেললে তোমার যে-অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা হবে।

তাহলে খুব বেশি টাকা ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনাকে বের করতে হলে বিভট্রনটি বন্ধ করতে হবে, ছ'টা টান্সফর্মার থামিয়ে দিতে হবে, সবগুলি ফিল্ম এক্সপোজড্ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে ছয় হাজার নব্বই টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। সেই তুলনায় আপনার মূল্য মাত্র চার শ' আশি টাকা।

চার শ' আশি টাকা?

হ্যাঁ। মানুষের শরীর যেসব বায়োকেমিক্যাল কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরী, খোলা বাজারে তার সর্বোচ্চ মূল্য চার শ' আশি টাকা।

অসহ্য ক্রোধে আমি দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলাম। এই নির্বোধ রবোটটিকে আমি কীভাবে বোঝাব যে চার শ' আশি টাকা বাঁচানোর জন্যে নয়, আমাকে বাঁচানোর জন্যই আমার এখান থেকে বের হওয়া দরকার। একটা মানুষের মূল্য শুধুমাত্র পার্থিব মূল্য নয়, তার থেকেও বেশি কিছু—কিন্তু তাকে সেটা কে বোঝাবে? অল্প কিছু কারিগরি জ্ঞান আর তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতর্ক ছাড়া এটি আর কিছু বোঝে না। তবু আমি আশা ছাড়লাম না। রবোটটিকে ডাক দিলাম, এই, শোন।

বলুন।

আমি এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব।

জানি।

আমি মারা গেলে এই এক্সপেরিমেন্টটার কোনো মূল্য থাকবে না। আর কেউ এর ফলাফল বুঝতে পারবে না।

আচ্ছা।

কাজেই আমাকে বের হতে দাও।

আমাকে বলা হয়েছে আমি যেন সবচেয়ে কম ঝামেলায় এই পরীক্ষাটি শেষ করি। এর ফলাফল নিয়ে কী করা হবে না-হবে সেটা জানা আমার দায়িত্ব নয়। আমি ভেবে দেখেছি, সবচেয়ে কম ঝামেলা হয় আপনাকে ভিতরে আটকে রাখলে। আপনাকে বের করতে হলে আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে। সেটি সম্ভব নয়,কাজেই আপনি ভিতরেই থাকুন—আপনার মৃত্যুতে খুব বেশি একটা আর্থিক ক্ষতি হবে না।

ইডিয়ট—আমি তীব্র স্বরে গালি দিলাম, সান অব এ বিচ।

আপনি অর্থহীন কথা বলছেন। রবোটটির গলার স্বর একঘেয়ে যান্ত্রিকতায় নিষ্প্রাণ।

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। এখন কী করতে পারি? এই বিরাট ল্যাবরেটরির অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতর আমি একান্তই অসহায়। হতাশায় আমি নিজের চুল টেনে ধরলাম।

তক্ষুনি নজরে পড়ল, এক কোণায় ঝোলানো টেলিফোন। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো, হ্যালো।

কে? প্রফেসর?

হ্যাঁ। আমি ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি।

আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনাকে বাইরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে রবোট।

রবোটের কানেকশান কেটে দাও।

ওটার কোনো কানেকশান নেই—একটা পারমাণবিক ব্যাটারি সোজাসুজি বুকে লাগানো।

সর্বনাশ! তা হলে উপায়?

আমরা দেখি কী করতে পারি। ঘাবড়াবেন না।

রিসিভারটি ঝুলিয়ে রেখে আমি বিভাট্রনে হেলান দিলাম। একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভিতর পরীক্ষাটি শুরু হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি মারা যাচ্ছি। রবোটটিকে বিকল করা সম্ভব নয়। রবোটটিকে বিকল না করলে এই পরীক্ষাটি বন্ধ করা যাবে না। আর এই পরীক্ষাটি বন্ধ না হলে আমার মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

সময় ফুরিয়ে আসছে, আমার ঘড়ি দেখতে ভয় করছিল। তবু তাকিয়ে দেখলাম আর মাত্র ছয় মিনিট বাকি। ছয় মিনিট পরে আমি মারা যাব। আমার স্ত্রী বুলা কিংবা ছেলে টোপন জানতেও পারবে না আমি ইঁদুরের মতো ল্যাবরেটরির ভিতর আটকা পড়ে মারা গেছি!

আমার শেষবারের মতো বুলাকে একটা ফোন করতে ইচ্ছে হল। ফোন তুলে ডায়াল করতেই বুলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো।

কে? বুলা?

হ্যাঁ।

শোন—ঘাবড়ে যেও না। আমি একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

কি? বুলার স্বর কেঁপে গেল।

ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি। বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। রবোটটি এত নির্বোধ, আমাকে বের হতে দিচ্ছে না! এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করতেও রাজি নয়। আর ছয় মিনিট পরেই ভয়ানক রেডিয়েশান শুরু হয়ে যাবে। একেবারে সোজাসুজি মারা যাচ্ছি।

বুলা একটা আর্তচিৎকার করল।

কী আর করা যাবে—টোপনকে দেখো। আমার গলা ধরে এল, তবু স্বাভাবিক স্বরে বললাম, বাইরে অবশ্যি সবাই খুব চেষ্টা করছে আমাকে বের করতে। লাভ নেই—

শোন—শোন—বুলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

কী?

তোমাদের রবোটটি কী ধরনের?

বাজে। একেবারেই বাজে। পি-টু ধরনের।

যুক্তিতর্ক বোঝে?

বোঝে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর লজিক খাটায়।

তা হলে একটা কাজ কর।

কি?

রবোটটিকে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

মানে?

বুলার কণ্ঠস্বর অধৈর্য হয়ে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় দ্রুত বলল, রবোটটার সামনে

দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি। অর্থাৎ তুমি বলবে যে তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

লাভ?

আহা। বলেই দেখ না। দেরি করো না।

আমি ল্যাবরেটরির শেষ ঘরে পৌঁছে আবার ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে মাথা বের করলাম। নির্বোধ ধাতব রবোটটি স্থির হয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, এই, এই রবোট।

বলুন।

আমি স্পষ্ট স্বরে থেমে থেমে বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

রবোটটি দু'-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আপনি বলছেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন; কাজেই আপনার এই কথাটি মিথ্যা। অর্থাৎ আপনি সত্যি কথা বলছেন। অথচ আপনি বললেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অর্থাৎ আপনার এই কথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু আপনি বলছেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—কাজেই একথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। অথচ আপনি মিথ্যা কথা বলছেন...অর্থাৎ সত্যি কথাই বলছেন... মিথ্যা কথা বলছেন... সত্যি কথা বলছেন...

রবোটটি সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একবার বলতে লাগল, আপনি সত্যি কথা বলছেন, পরমুহূর্তে বলতে লাগল, মিথ্যা কথা বলছেন। এই ধাঁধাটি মিটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এটি সারা জীবন এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে পরস্পরবিরোধী কথা বলতে থাকবে। আমার বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল।

ল্যাবরেটরির ভিতরে এসে শুনলাম ঝনঝন করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলতেই বুলা চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে?

চমৎকার! গাধা রবোটটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। বুলা, তুমি না থাকলে আজ একেবারে মারা পড়তাম। কেউ বাঁচাতে পারত না।

রিসিভারে শুনতে পেলাম বুলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যি আমি বুঝতে পারি না, আনন্দের সময় মানুষ কেন যে কাঁদে!

বাইরে তখন লেসার বীম দিয়ে ইমার্জেন্সি এক্সিটটি ভাঙা হচ্ছে। রবোটটির ধাঁধা না মেটানো পর্যন্ত ওটা পরীক্ষা শুরু করতে পারবে না। হাতে অফুরন্ত সময়।

আমি বিভট্রনে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর একটা সিগারেট ধরালাম, এখানে সিগারেট ধরানো সাংঘাতিক বেআইনি জেনেও।